গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ১২ - ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি

এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ২ সেপ্টেম্বর গেজেট নোটিফিকেশনে বলেছে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের আটক করার জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে হবে। এই স্বৈরাচারী নির্দেশের আমরা তীব্র নিন্দা করি। অবৈধ অভিবাসী সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় ভারতের বর্তমান আইন এবং আইনি ব্যবস্থাটিই যথেষ্ট কার্যকরী। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাম্প্রতিক নির্দেশিকাটি তাই একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করলাম, নতুন নির্দেশিকাটি অত্যন্ত সুকৌশলে রচিত হয়েছে বিশেষ মতলব থেকে। এই নির্দেশিকা মনে করিয়ে দিচ্ছে ভারতের যেখানে যেখানে এই ধরনের ডিটেনশন ক্যাম্প আছে, সেখানেই নির্বিচারে ও একতরফাভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের গরিব মানুষকে অবৈধ অভিবাসী বলে দাগিয়ে আটক করা হচ্ছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের মতো বা তার থেকেও খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আসামে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

জিএসটি কমায় সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে কি

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পণ্য এবং পরিষেবার উপর চাপানো করের (জিএসটি) চারটি ধাপকে দুটিতে নিয়ে এসেছে। বেশ কিছু পণ্যের কর ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ এবং আরও কিছু পণ্যের কর ১৮ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নিয়ে এসেছে তারা। আবার কিছু পণ্যের কর ২৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন কর হার চালু হতে চলেছে। কিছু পণ্যে কর কমানোর বিষয়টিকে বিজেপি সরকারের এক বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখাতে প্রধানমন্ত্রী নিজে যেমন ময়দানে নেমে পড়েছেন, তেমনই নামিয়ে দিয়েছেন গোটা দলকে। তাঁদের ভাবটা এমন যেন, জিএসটি কমায় জিনিসপত্রের দাম এতখানি কমে যাবে যে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনায়াসেই কিনতে পারবে। তার ফলে মুষড়ে পড়া বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং তার পরিণতিতে উৎপাদনে গতি আসবে, অর্থনীতিও মজবুত হবে। মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর এমন চেষ্টা এর আগে দেশের রাষ্ট্রনায়করা বহু বার করেছেন। কিন্তু বাস্তবটা ঠিক কী একবার দেখে নেওয়া যাক। বিজেপি সরকার ‘এক দেশ এক কর’ নীতির নামে আগেকার বিভিন্ন স্তরের কর এবং পরে চালু হওয়া

দুয়ের পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জ ঃ নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে

১২ ঘণ্টা সর্বাত্মক বনধ, আক্রান্ত ছাত্ররা

সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি থেকে আসামের ঐতিহ্যমণ্ডিত করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ‘করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটি’র ডাকা ৬ সেপ্টেম্বরের জেলা বনধ সর্বাত্মক সফল হল। এ দিন জেলার সর্বত্র জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বনধের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। জেলা সদর করিমগঞ্জ সহ জেলার প্রধান প্রধান জায়গা বদরপুর, ভাঙা বাজার, নিলামবাজার, আছিমগঞ্জ, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ইত্যাদিতে হাটবাজার, দোকানপাট, স্কুল কলেজ, যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সমগ্র জেলায় বনধের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সমগ্র জেলায় গ্রেপ্তার দুই শতাধিক পিকেটার। কয়েক জন মহিলা সহ কিছু পিকেটারকে থানায় রাতভর আটকে রাখা হয়।

বনধের দিনে করিমগঞ্জ

এই বনধকে ঘিরে কয়েকদিন আগে থেকেই চলছিল বিতর্ক। সরকার ও শাসক দল বিজেপির মদতপুষ্ট কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে। আগের দিন করিমগঞ্জ শহরে মিছিল করে ব্যবসায়ীদের হুমকি দেয় দোকানপাট খোলা রাখার জন্য। অটো, ই-রিক্সা চালকদেরকেও হুমকি দেয়। প্রশাসন বনধ ব্যর্থ করতে সমগ্র জেলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা বলবৎ করে। বনধের দিন সকালে বিজেপির মদতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতী এ সি সেন রোডে পিকেটারদের উপর চড়াও হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে বাহুবলী কায়দায় আক্রমণ করে। এমনকি মহিলা পিকেটাররাও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। দুষ্কৃতীরা মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করে।

আটের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিশাল মহিলা মিছিল

৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা শহর দেখল মহিলাদের এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভ মিছিল। বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ (কলেজ স্কোয়ার) থেকে মিছিল করে প্রায় ৫ হাজার প্রতিবাদী মহিলা দৃপ্তস্বরে স্লোগান দিতে দিতে রাজপথ মুখরিত করে এগিয়ে চললেন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের দিকে। তাঁরা স্লোগান তুললেন— অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি সহ কসবা ল কলেজের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি, নারী নির্যাতন বন্ধকরা এগুলো ছিল প্রধান দাবি। এ ছাড়াও দাবি উঠল মদ-জুয়া-সাট্টা-লটারি বন্ধ করতে হবে, মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সমকাজে সমমজুরি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের শ্রমিকের স্বীকৃতি দিতে হবে ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার প্রতিবাদী মহিলা, ছোট্ট একরত্তি শিশু কোলে মায়েরাও এ মিছিলে সামিল হন। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে গ্রামগঞ্জ-শহর থেকে আসা মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল দেখিয়ে দিল— যে কোনও বাধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্য স্থির রেখে কীভাবে

চারের পাতায় দেখুন

জিএসটি ঃ মানুষের সুবিধা হবে কি

দুয়ের পাতার পর

ভ্যাট তুলে দিয়ে জিএসটি চালু করে। সরকার তখন বলেছিল, এর ফলে ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়েছে নাকি কর ফাঁকি? পাইকারি বাজারে যাদের যাতায়াত আছে, যাদের কেনাকাটা করতে হয়, তাঁরা জানেন, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কত রকমের বিল, কত রকমের চালান, কত রকমের টুকরো কাগজে কেনাবেচা চলে। যদিও সাধারণ মানুষ সেই করের হাত থেকে রেহাই পায় না।

চড়া হারে কর বসানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না

২০১৭ সালে মোদি সরকার যখন উপযুক্ত পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিটুকুও না নিয়ে জিএসটি চালু করে তখনই দেশ জুড়ে প্রবল প্রশ্ন উঠেছিল যে, পণ্য এবং পরিষেবার উপর এমন বিপুল হারে কর চাপানোর কোনও প্রয়োজন আছে কি? বিপুল হারে চাপানো এই কর তো শেষ পর্যন্ত জনগণকেই মেটাতে হবে। সংকট-জর্জরিত জনগণের কি তা বইবার মতো ক্ষমতা রয়েছে? তা ছাড়া, জিএসটি চালুর সঠিক প্রস্তুতি না থাকায় বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তার হিসাবপত্র খুবই জটিল হয়ে পড়ে তাঁদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার সে দিন জনমতের কোনও তোয়াক্কা করেনি, ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধা-অসুবিধারও কোনও তোয়াক্কা করেনি। জিএসটি চালুর ফলে এক ধাক্কায় জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বেড়ে যায়। এমনিতেই বেকারত্ব, ছাঁটাই, কম মজুরির মতো অজস্র সমস্যায় জর্জরিত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেমে যায় আরও নিচে। সরকারের জিএসটি নীতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ মোদি সরকারের ব্যর্থতার মুকুটে নোট বাতিলের পর জিএসটিও যুক্ত হয়। কিন্তু জিএসটি নীতির ব্যর্থতা বুঝতে এবং তার পরিবর্তন করতে সরকারের এত বছর সময় লাগল কেন?

জনগণকে সুরাহা দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য নয়

জিএসটি চালুর মধ্যে দিয়ে সরকার জনগণের থেকে নজিরবিহীন কর আদায় করে চলেছে। বছরে এখন জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের (৯ মাস) তুলনায় এই কর তিনগুণের বেশি (৭.১৯ লক্ষ কোটি টাকা) এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ (১১.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা)। কিন্তু সরকারের কর আদায় যতই বাড়ুক মানুষের কেনার ক্ষমতার অভাবে অভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় আমেরিকা ভারতের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় সঙ্কট তীব্র আকার নিয়েছে এবং রফতানি বাণিজ্য বড় প্রশ্নের মুখে, তখন সরকারকে অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর জোর দিতে হচ্ছে। তার জন্য মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর কথা ভাবতে হচ্ছে। এই অবস্থায় জিএসটির স্ল্যাব কমানো ছাড়া সরকারের হাতে আর কোনও রাস্তাই খোলা নেই। সরকার যদি সত্যিই মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়াতে চাইত, তবে নামমাত্র জিএসটি কমানোর চালাকি না করে সবার আগে জিসিপত্রের চড়া দামে লাগাম পরানোর উদ্যোগ নিত। চাল ডাল তেল আটা শাক-সবজির দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তা ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানো, শূন্যপদে এবং নুতন নিয়োগ করে মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করত। ধনকুবেরদের করছাড়, ব্যাঙ্কঋণ মকুব বন্ধ করে তাদের উপর সম্পদ কর চাপিয়ে সমাজে বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করত। এ সব কোনও কিছুই করেনি সরকার। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে সুরাহা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, সরকার ঝিমানো বাজার খানিকটা চাঙ্গা করার লক্ষ্য নিয়েই কিছু পণ্যে কর কমিয়েছে। যদিও সরকার হিসাব কষেই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিছু পণ্যে যেমন কর কমিয়েছে, তেমনই বেশ কিছু পণ্যে তা যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। এই কমানো বাড়ানোর শেষে সরকারের মোট কর সংগ্রহে তেমন কিছু হেরফের ঘটছে না। যা ঘটছে তা নামমাত্র— ২ শতাংশ, টাকার অঙ্কে যা মাত্র ৪৭ হাজার কোটি টাকা। সরকারের আশা বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ বাড়লে এই অঙ্কও উসুল হয়ে যাবে।

কর ছাড়ের সুবিধা মানুষ কতটুকু পাবে?

এখন প্রশ্ন উঠেছে, যে সব পণ্যে সরকার কর কমিয়েছে সেই পরিমাণে কি জিনিসপত্রের দাম কমবে? জনসাধারণ কি সত্যিই সেই সুবিধাটুকু পাবে? জনসাধারণ যাতে তা পায় তা দেখার কোনও নজরদারি ব্যবস্থা কি সরকার নিয়েছে? শুনতে অবাক লাগলেও এ প্রশ্নের উত্তর— না, সরকার তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। শিল্পমহলের আশ্বাসের উপরই সরকার পুরোপুরি ভরসা করেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, "যতখানি জিএসটি কমেছে, তার পুরো সুবিধাই যাতে শিল্পমহল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শিল্পমহল আশ্বাস দিয়েছে, পুরো সুবিধাই আমজনতার হাতে যাবে।" বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন, "শিল্পমহল আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, জিএসটি কমার ১০০ শতাংশ সুবিধা মানুষ পাবে।" অর্থাৎ বিজেপি মন্ত্রীরা বিড়ালের হাতেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন মাছ পাহারা দেওয়ার!

মুনাফাখোরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকার তুলে দিয়েছে

কিন্তু বিজেপি সরকার এবং তার মন্ত্রীদের শিল্পমহলের উপর এমন অগাধ আস্থার কারণ কী? শোষণ, বঞ্চনা এবং প্রতারণাই যে পুঁজিবাদের ভিত, তার উপর দাঁড়িয়ে পুঁজিপতিদের উপর এই আস্থা কি বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সরলতার লক্ষণ, নাকি শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের আর এক দফা লুটের ব্যবস্থা করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য? ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা যে এর সুবিধা পুরোপুরি জনসাধারণের হাতে তুলে দেবে না, যতদূর সম্ভব বেশি লুটে নেওয়ার চেষ্টা করবে, অতীতে তা দেখা গেছে। এই যেমন, দেশের শীর্ষ ধনকুবের মুকেশ আম্বানি বলেছেন, তিনি জিএসটি কমার সুবিধা ভাগ করে দেবেন দেশবাসীকে। উদারতা মুগ্ধ হওয়ার মতো! অথচ ইনি সেই মুকেশ আম্বানি যিনি দেশের মানুষকে বিনা খরচে ফোনের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে সবার হাতে জিও ফোন তুলে দিয়েছিলেন। মানুষ জানেন, এখন জিও ফোনের খরচ লাফিয়ে বেড়ে চলেছে এবং দেশে তার খরচ সর্বোচ্চ।

এখন কথা উঠেছে যে, কেন্দ্রের উচিত ছিল কেন্দ্রীয় জিএসটি আইনের ১৭১ নম্বর ধারা মেনে মুনাফাখোরি প্রতিরোধ সংস্থা তৈরি করা। কিন্তু সরকার তা করেনি। এখন কাউকে এই সুযোগ আত্মসাৎ করতে দেখলেও কোথাও সেই অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সরকার এমন কোনও সংস্থা তৈরি করল না কেন? জিএসটি চালুর সময়ে মুনাফাখোরি প্রতিরোধ সংস্থা তৈরি হয়েছিল। তাতে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার মুনাফাখোরির অভিযোগও জমা পড়েছিল। কিন্তু এ বছর ১ এপ্রিল থেকে ওই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরকার জেনেবুঝেই মুনাফাখোরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখেনি যাতে শিল্পমহল জনগণের উপর অবাধে লুঠতরাজ চালাতে পারে।

সহজে ব্যবসার নামে সহজে লুঠের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের বক্তব্য, এর ফলে 'ইন্সপেকশন রাজ' তৈরি হয়। ব্যবসার সহজ পরিবেশ নষ্ট হয়। অবাক ব্যাপার! মুনাফাখোরি অর্থাৎ জনগণের উপর অন্যায় লুঠ আটকানোর নাম হয় ইন্সপেকশন রাজ, আর তা চলতে দেওয়ার নাম ব্যবসার সহজ পরিবেশ। সরকারের এই মনোভাবের পরও বুঝতে অসুবিধা হয় কি যে জিএসটি ছাড়ের কেমন সুবিধা জনগণ পেতে চলেছে! রাজস্ব সচিব অরবিন্দ শ্রীবাস্তব আবার এক অদ্ভুত কথা বলেছেন— শিল্পমহলকেও বুঝতে হবে, দাম কমলে এবং তার ফলে বেচাকেনা বাড়লে তাদেরই লাভ। যেন এত বড় একটা সত্য পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের অজানা ছিল! রাজস্ব সচিবই সেই সত্যকে প্রকাশ্যে আনলেন! শিল্পমহল যদি তাই বুঝত তবে তো পুঁজিবাদে শোষণই থাকত না। কারণ, সবাই জানে, শোষণের কারণে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কমে। আর ক্রয়ক্ষমতা কমলে বাজারে বিক্রি কমে। তাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিপরীতে শ্রমিকের হাতে বেশি টাকা থাকলে তারা বেশি পণ্য কেনে। তাতে বাজারে বেচাকেনা বাড়ে। পরিণতিতে উৎপাদনে গতি আসে। বাজার চাঙ্গা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো কোনও মালিক শ্রমিককে এতটুকুও কম শোষণ করে না! শ্রমিকরা দাবি করলেও এতটুকু বেতন বাড়াতে রাজি হয় না! শিল্পমহলের উপর মন্ত্রী-আমলাদের এমন আস্থা বাস্তবে, সুন্দরবনে দাঁড়িয়ে বাঘকে নিরামিশাষী হতে বলার সমান।

জনগণকে লুঠ করতেই চড়া কর

নিজেদের যত কষ্টই হোক, জনগণ এই কর দিতে রাজি হত যদি তারা বুঝত তাদের এই করের টাকা তাদের উন্নয়নেই ব্যয় হবে। বাস্তবে প্রতিদিন তারা দেখছে যে, এই যে বিপুল পরিমাণ কর, যা একেবারে দীন-হীন নিম্নস্তর পর্যন্ত জনগণের ঘাড় ভেঙে সরকার আদায় করে চলেছে, সরকার কী কাজে তা ব্যয় করছে। তা কি জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় হয়? তবে কেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রোগে ওষুধ জোটে না, কেন তাদের ঘরে জমাট হয়ে থাকা অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকার যত দিন যায় আরও গভীর হয়ে ওঠে? কেন তাদের মাথার উপর একটা স্থায়ী ছাদ জোটে না? অন্য দিকে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি, ধনীদের ব্যাঙ্কে মুনাফার পাহাড় ক্রমেই আকাশ ছুঁতে থাকে। বাস্তবে জনগণের দেওয়া করের টাকার বেশির ভাগটাই ব্যয় হয় পুঁজিপতিদের কর ছাড় দিতে, তাদের শত-সহস্র কোটি টাকার ব্যাঙ্কঋণ মকুব করতে। আর ব্যয় হয় এমএলএ এমপি মন্ত্রী আমলাদের বিদেশ ভ্রমণে, এসি ট্রেন আর বিমান ভ্রমণে, বিলাসবহুল জীবনযাপনে। আর এক বিপুল অংশ ব্যয় হয় নেতা-মন্ত্রীদের বিপুল দুর্নীতিতে, যার একটা অংশ ঘুরপথে ফিরে আসে শাসক দলগুলির তহবিলে, যা তারা দেদার খরচ করে অসচেতন মানুষের ভোট কিনতে। করের টাকার আর একটা বৃহৎ অংশ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা খাতে। বাস্তবে দেশের প্রতিরক্ষার নামে এই টাকা তারা ব্যয় করে উৎপাদন শিল্পের মন্দা কাটাতে, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরির সঙ্গে যুক্ত পুঁজিপতিদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য। তাই দেশে আজ প্রতিরক্ষা শিল্পই প্রধান শিল্প হয়ে উঠেছে। তাই শুধু এ দেশের নয়, দেশে দেশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মুখে কোথাও শান্তির কথা শোনা যায় না, তাঁদের মুখে শুধুই যুদ্ধের কথা। তাই দেশে দেশে আজ শুধুই অস্ত্রচুক্তি। এই ভাবে সরকার যতই সাধারণ মানুষকে নিংড়ে নিতে থাকে, যতই সাধারণ মানুষের জীবন শুষ্ক, কঠিন, নির্জীব হয়ে ওঠে, ততই শাসক হয়ে বসে থাকা মুষ্টিমেয় অতি ধনী শ্রেণির জীবন আতিশয্যে, অপব্যয়ে উছলে পড়ে। এই যে বৈপরীত্য, এই যে বৈষম্য, এই নিঃশব্দ নিপীড়নের চরিত্র আজ উন্মোচিত।

বাস্তবে দেশের মানুষকে বর্তমান সমাজব্যবস্থার শোষণের চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা তথা জনগণকে লুটের ব্যবস্থা করে দেওয়াই তাদেরই নিয়োজিত সরকারের কাজ। অতীতের সব সরকারের মতোই বিজেপি সেই কাজটিই করে চলেছে। জিএসটি বসানো বা কমানো কোনওটির সঙ্গেই জনগণকে সুরাহা দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

আফগানিস্তানে মহিলাদের উদ্ধারে তালিবানি ফতোয়ার তীব্র নিন্দা

ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে শাসক তালিবানের ফতোয়ার জেরে উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া বিপন্ন মহিলাদের উদ্ধার করতে পারছেন না। সে দেশে মহিলাদের দেহ অনাত্মীয় পুরুষদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ৭ সেপ্টেম্বর এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় কমিটি এক বিবৃতিতে এই অমানবিক নিয়মের তীব্র নিন্দা করেছে। তালিবানি শাসনে ডাক্তারি সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ায় মহিলা উদ্ধারকারীও সে দেশে অমিল। যাতে স্পর্শ করতে না হয়, সে জন্য মৃতদেহের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে মৃত মহিলাদের পোশাক ধরে টেনে-হিঁচড়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করা হচ্ছে। এতে স্পষ্ট হল, অন্ধবিশ্বাস ও মৌলবাদী চিন্তাভাবনা অনিবার্য ভাবে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের জন্ম দেয় ও সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে।

সংগঠন গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়েছে, তালিবান সরকারের কার্যকলাপের নিন্দায় সরব হোন। আফগানিস্তানের অসহায় মহিলাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। সে দেশে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসারের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো এবং সমগ্র মানবসমাজকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে এআইএমএসএস।

যদি সর্বহারা গণতন্ত্র পুরোপুরি রূপায়িত না হয় চিন একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হবে

— মাও সে তুং

আমাদের মধ্যে কিছু কমরেড আছেন, নিজেদের মতের বিরোধী কোনও মতামত শোনার ধৈর্যটুকুও যাঁদের নেই। কোনও সমালোচনাই তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। এ অত্যন্ত অন্যায়। এই কনফারেন্স চলাকালেই একটি প্রদেশের গ্রুপ মিটিং হচ্ছিল। শুরুটা খুব প্রাণবন্ত হল। কিন্তু যেই প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক আসন গ্রহণ করতে সভায় ঢুকলেন, ব্যস! চাপা গলায় 'চুপ চুপ' বলে আর কেউ মুখ খুলল না। কমরেড প্রাদেশিক সম্পাদক, এই যদি হয়, তবে তখন আপনার সেখানে যাওয়ার দরকার কী? আপনি আপনার ঘরে বসে চিন্তা করলেই পারতেন। অন্যদের মন খুলে কথা বলতে দিতেন! চারপাশে এমন পরিবেশই যেখানে তৈরি হয়েছে, আপনি উপস্থিত থাকলে মানুষ যখন মুখ খুলতে সাহসই পাচ্ছে না, তখন আপনার তো সেখানে না থাকাই উচিত। ভুল যিনিই করুন, আত্মসমালোচনা তাঁকে করতেই হবে। আর দেখুন, যাতে অপরে মন খুলে কথা বলতে পারে। অন্যদেরও সমালোচনা করতে দিন। ...

গত বছরের ১২ জুন ছিল পিকিংয়ের ওয়ার্কিং কনফারেন্সের সমাপ্তি দিবস। কনফারেন্স আহ্বান করেছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। আমি সে দিন আমার নিজের ভুল এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কমরেডদের আমি বলেছিলাম, আমার কথাগুলি প্রদেশে প্রদেশে অঞ্চলে অঞ্চলে পৌঁছে দিতে। পরে আমি দেখেছি বহু অঞ্চলকে সে সব কথা জানানোই হয়নি। যেন, আমার ভুল হলে তা গোপন রাখা যায় বা গোপন রাখাই উচিত। কমরেডস, আমি মনে করি, তা কখনওই উচিত নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির যা ভুলভ্রান্তি, তার মধ্যে যেগুলির সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত, সেগুলির জন্য

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ - ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

আমি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর, যে ক্ষেত্রে আমি সরাসরি জড়িত নই, সে ক্ষেত্রেও আমার আংশিক দায়িত্ব আছে। কারণ, আমিই কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, অন্যেরা তাঁদের ভুলের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন। অন্য কমরেডদেরও দায়িত্ব আছে। কিন্তু সর্বপ্রথম দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। প্রিফেক্ট কাউন্টি পার্টি কমিটি থেকে শুরু করে নিচের দিকে স্তরে স্তরে জেলা, বিভিন্ন সংস্থা এবং কমিউন পার্টি কমিটির সম্পাদক পদে যাঁরা আছেন, ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসাবে কাজের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঘাটতির দায়দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা, দায়িত্ব নিতে ভয় পাওয়া এবং জনগণকে মুখ খুলতে না দেওয়া— যেন মুখ খুললেই বাঘের লেজ মুচড়ে দেওয়া হল— এই রকম মনোভাব নিয়ে যদি দশজনও চলেন, আমি বলছি সেই দশজনেরই নিশ্চিত অধঃপতন ঘটবে। আজ হোক আর কাল হোক, মুখ মানুষ খুলবেই। আপনারা কি ভাবছেন, আপনারা সব এমন বাঘ যে মানুষ আপনাদের লেজে হাত দিতে সাহসই পাবে না? সেই দুঃসাহস জনগণই দেখাবে।

দলের অভ্যন্তরে এবং জনজীবনে গণতন্ত্রের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা যদি আমরা না করি, সর্বহারার গণতন্ত্রকে পুরোপুরি রূপায়িত না করি, তা হলে চিনের পক্ষে সর্বহারার কেন্দ্রিকতা অর্জন করা অসম্ভব। উন্নত মানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে উন্নত মানের কেন্দ্রিকতার জন্ম দেওয়া যায় না। আর, উন্নত মানের কেন্দ্রিকতা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। যদি আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সার্থকভাবে রূপায়িত করতে না পারি, তবে দেশ ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে? এটা একটা শোধনবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। অর্থাৎ একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সর্বহারার একনায়কত্বের বদলে আসবে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র যা একটা প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের নামান্তর। এ ব্যাপারে আমাদের সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবং আমি আশা করি কমরেডরা এ সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় মাও সে তুং।

শুল্কযুদ্ধের উলুখাগড়া সাধারণ শ্রমিকরাই

২৯ আগস্ট জাপানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন বলছেন, 'সারা বিশ্ব শুধু ভারতের দিকে তাকিয়ে নেই, তাকে সমীহ করে চলে', ঠিক তখনই গুজরাটের সুরাট, উত্তরপ্রদেশের নয়ডা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর একাধিক জায়গায় ভারতের রপ্তানিযোগ্য সুতি বস্ত্র, জুতো, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, দামি পাথর, হীরে ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন কমার সম্ভাবনায় কাজ হারানোর ভয়ে বহু শ্রমিকের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। জৈব রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল, তামার ফিনিশড বা সেমি ফিনিশড জিনিসের কারিগররাও শঙ্কিত। ২৭ আগস্ট ভারতীয় পণ্যের ওপর নরেন্দ্র মোদিজির 'পরম মিত্র' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের চাপানো বাড়তি ৫০ শতাংশ শুল্ক চালু হয়ে যাবার পর থেকে দেশের, বিশেষত শ্রমনিবিড় উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে চিত্রটা এমনই নৈরাশ্যজনক।

কিন্তু কেন? ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারত। প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ, বনজ কোনও সম্পদেরই তো অভাব নেই! এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের শ্রমশক্তিতেও কিছু কম পড়েনি! তা হলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করতে বেশি শুল্ক লাগবে, মার্কিন বাজারে তার দাম বাড়বে— তাতে ভারতে কেন এত গেল গেল রব? এই শুল্ক চালু হতেই প্রধানমন্ত্রীকে চিনের সাথে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দিতে ছুটতে হল কেন? চিন-রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে হাসিমুখের ছবি এত প্রচার করত হচ্ছে কেন?

ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হয় মোটামুটি ৮৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য, আমদানি হয় ৪৫.৩৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। পণ্যের দিক থেকে ভারত ৪১.৬৭ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য করে থাকে। এ কথা ঠিক বাড়তি ৫০ শতাংশ শুল্ক যোগ হলে সে দেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের দাম প্রচুর বেড়ে যাবে। একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া দুনিয়ার কোনও দেশের পণ্যে মার্কিন সরকার এত শুল্ক চাপায়নি। ফলে চিন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া পণ্যের তুলনায় ভারতীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাবে।

তাতে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমবে। এর ধাক্কায় ভারতীয় কোম্পানিগুলো উৎপাদন কমালে বস্ত্র শিল্পে যুক্ত ৪ কোটি, হীরে পরিশোধন ও দামি পাথরের শিল্পে যুক্ত ৫০ লক্ষ, মাছ-চিংড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত ২৫ লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগারে টান পড়ার সম্ভাবনা আছে। একই ভাবে ইস্পাত, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও রপ্তানি কমলে তার প্রভাব শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে পড়বেই। ওষুধ ও বৈদ্যুতিন পণ্যে আপাতত এই শুল্ক অবশ্য কার্যকরী হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি পুঁজিপতিদের জন্য বাজারের খোঁজে চিনের হাত ধরতে সাংহাই কো-অপারেশন অরগানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে ছুটতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

বাজার দখলের যুদ্ধের একটি স্তর— শুল্ক যুদ্ধ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সব দেশের সাথেই শুল্ক নিয়ে নানা চুক্তির কথা বলছেন। যদিও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বাজারের অনিশ্চয়তা এতটাই বেশি যে এক ইন্দোনেশিয়া আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছাড়া কারও সঙ্গেই চুক্তি সম্পূর্ণ হয়নি। চিনের ক্ষেত্রে অনেক বড় হুমকি দিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত সুর নরম করেছেন। মার্কিন সরকার ভারতের ওপর চাপ দিচ্ছে রাশিয়া থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনা কমিয়ে তা মার্কিন কোম্পানি থেকে কিনতে। বিশ্ববাজারের দখল নিয়ে রাশিয়া-চিনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে লড়তে ও মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গীন দশায় দেশের শিল্পকে চাঙ্গা করতে এটা তাঁর দরকার। শুল্ক যুদ্ধ আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখলের চলমান যুদ্ধেরই একটা স্তর। কামান বোমা বন্দুক নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে যে খেটে খাওয়া মানুষ মারা যায়, এই যুদ্ধের শিকারও তারাই। ভারতে যেমন ক্ষুদ্র বা মাঝারি অর্থাৎ এমএসএমই কোম্পানিগুলির কম মজুরির চুক্তিভিত্তিক যে শ্রমিকরা রপ্তানি বাজারের ভরসা, তাঁরাই এই শুল্ক যুদ্ধে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একইভাবে মার্কিন বাজারেও এই ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলির পক্ষে উৎপাদনের উপকরণ দামি হয়ে উঠলে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই সমস্যা হবে। সস্তা শ্রমের কারণেই ভারতীয় পণ্যের চাহিদা মার্কিন পুঁজিকর্তাদের কাছে বেশি। তাই নিজের দেশে উৎপাদন না করিয়ে তাঁরা ভারতে অর্ডার দেন।

এদিকে আমেরিকায় বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের বেশি, জিনিসের দাম এক বছরে বেড়েছে ১৭ শতাংশ, সরকারি ফুড কুপন ও লঙ্গরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থনীতির গতি ধীর হচ্ছে, কাজ সৃষ্টি হচ্ছে কম, তাতে সঠিক মজুরিও মিলছে না। অথচ, মার্কিন একচেটিয়া মালিকদের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি সস্তা শ্রম নির্ভর দেশগুলিতে কাজ করিয়ে নিয়ে স্বদেশে ও বিদেশের বাজারে বেচে বিপুল মুনাফা করছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে চিন আমেরিকার থেকে এগিয়ে। শিল্পদ্রব্য, ইস্পাত, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও তার যন্ত্রাংশ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমেরিকা আমদানি নির্ভর। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম দফার ভোট প্রচারে তাঁর বিরোধীরা বলতেন— ট্রাম্পের নিজের প্রাসাদটিই তো চিনা ইস্পাতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় গেল গ্যাট-এর মিথ

এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প দেশের মানুষকে বুঝিয়েছেন, অভিবাসী, মেক্সিকান, ভারতীয়রাই তোমাদের সব চাকরি খেয়ে নিচ্ছে। আশ্বাস দিয়েছেন— 'ট্রাম্প এসেছে, এইবার সে সব কিছু কড়া হাতে মোকাবিলা করবে'। এই কারণেই তিনি অভিবাসীদের হাতকড়া বেঁধে ফেরত পাঠাচ্ছেন। কখনও কানাডা, গ্রিনল্যান্ড দখল করে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'-এর স্লোগান জোর গলায় তুলছেন। দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছেন, অন্য দেশের পণ্যে আমদানি শুল্ক

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলির উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শিলিগুড়িতে (ডান দিকের ছবি) যৌথ মিছিল

স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল

রাজ্য সরকার স্মার্ট মিটার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও ইতিমধ্যে লাগানো স্মার্ট মিটারগুলো খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। সেগুলি খুলে নেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের আরডিএসএস স্কিম বাতিল, বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, এফপিপিএএস নামে সারচার্জ আদায় বন্ধ করা, গৃহস্থে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউ মার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র ডাকে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন।

কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে সুসজ্জিত ট্যাবলোতে এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি গ্রাহকের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র সহ মিছিল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হয়। সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ অজয় চ্যাটার্জী, দার্জিলিং জেলার সংগঠক রঞ্জিত বাড়ই, পশ্চিম মেদিনীপুরের মানোয়ার আলি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক শঙ্কর মালাকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার সভাপতি অনুকূল ভদ্র। তাঁরা অভিযোগ করেন, একদিকে রাজ্য সরকার ক্ষুদ্রশিল্প মেলা করছেন, অন্য দিকে ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতি মাসে কেভিএ লোডে ২০০ টাকা মিনিমাম চার্জ ধার্য করায় রাজ্যের প্রায় অর্ধেক গমকল, হাস্কিং মিল, তেলকল সহ ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংসের মুখে। রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনে প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী।

মিছিল শেষে এসপ্ল্যানেডে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমাবেশ। ২ সেপ্টেম্বর

কলকাতায় মহিলা মিছিল

একের পাতার পর

এগিয়ে যেতে হয়। শুরুতে কলেজ স্কোয়ারে একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' নীতি মুখে বললেও গোটা দেশে আজ মেয়েরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী বলেন, আজকের দিনে মেয়েদের ঘরে বসে থাকলে চলে না, যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রতিরোধে তাঁদের ঝাঁপিয়ে পড়তেই হয়ে। রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত বলেন, পুলিশ-প্রশাসনের উপর ভরসা করে থাকলে হবে না, এলাকায় এলাকায় নারীবাহিনী গড়ে তুলে মদের প্রসার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে ঝাঁটা-লাঠি, হাতা-খুন্তি নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে, অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।

এ ছাড়া বিভিন্ন স্কিম ওয়ার্কার সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরকারের কাছে শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি ও অন্যান্য দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ধর্মতলায় পৌঁছানোর আগেই কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে ব্যারিকেড করে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। সেখানে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। রাজ্য সম্পাদক বলেন, ধর্মতলায় শাসক দলের অবস্থান চলার জন্য হাজার হাজার প্রতিবাদী মহিলাদের শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র মিছিলের গতি যেভাবে রুদ্ধ করা হল তা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। এর প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা রাস্তার উপর অবস্থান শুরু করেন। অবস্থান থেকে কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবিপত্র নবান্নে গিয়ে জমা দেন।

শিশুসন্তান নিয়েই মছিলে মা

পরিয়ায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে যুব বিক্ষোভ

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে নির্মম আক্রমণ, নিয়োগে দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, সকল বেকারের কাজ, সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, মদ-মাদক দ্রব্য, অনলাইন জুয়া, অশ্লীলতা, নারী নির্যাতন বন্ধ সহ সীমাহীন দুর্নীতির ফলে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল, এসআইআর-এর নাম করে ঘুরপথে এনআরসি চালুর পরিকল্পনা বাতিল এবং বাইক-ট্যাক্সি, ডেলিভারি বয় সহ প্ল্যাটফর্ম বেসড অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা, সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের দাবিতে ২-৯ সেপ্টেম্বর এআই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক দপ্তরে যুব বিক্ষোভ ও মিছিল হয়।

কলকাতা ঃ এআইডিওয়াইও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিক্ষোভ সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল, রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, কলকাতা জেলা সম্পাদক সমর চ্যাটার্জী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সঙ্গীতা ভক্ত। মলয় পাল বলেন, সপ্তাহব্যাপী সমস্ত জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এর পরও যদি সরকার দাবি না মানে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব। বক্তব্য রাখেন অন্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস। সভার পর সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলে বাইক ট্যাক্সি ও ডেলিভারি বয়রা উপস্থিত ছিলেন।

৪ সেপ্টেম্বর উক্ত দাবি সংবলিত স্মারকলিপি সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবু সাউ-এর নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দিতে যান, মন্ত্রী বিধানসভায় না থাকায় তাঁর দপ্তর স্মারকলিপি জমা নেয়।

মালদা ঃ ৩ সেপ্টেম্বর মালদা শহরে রথবাড়িতে বিক্ষোভ সভা এবং মিছিল হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক মাইতি। তিনি বলেন, দেশ জুড়ে যে ভাবে বিদ্বেষের রাজনীতি চলছে তাকে প্রতিহত করতে সর্বস্তরের যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া তিনি বলেন, উর্দু অ্যাকাডেমির উদ্যোগে কলকাতায় চার দিনের 'উর্দু ইন হিন্দি' সিনেমা অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের কর্মসূচি ছিল। রাজ্য সরকার মৌলবাদী কয়েকটি সংগঠনের চাপে তা বাতিল করেছে। ভোট রাজনীতির কারণেই সরকারের এই নতি স্বীকার। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন মালদা জেলা সভাপতি উজ্জ্বলেন্দু সরকার, আনন্দ সরকার, জেলা কমিটির সদস্য বিমল মুর্মু ও পরিতোষ রায়।

ইন্দোনেশিয়া জ্বলছে

গত কয়েক বছর ধরে মাঝে মাঝেই দেশে দেশে সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা গণরোষ আছড়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল ইন্দোনেশিয়ার নাম। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হাজারে হাজারে ছাত্র ও খেটে-খাওয়া মানুষ রাজপথে নেমে এসেছেন। পুলিশি সন্ত্রাস উপেক্ষা করে বেপরোয়া জনরোষে উত্তাল রাজধানী জাকার্তা সহ ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহর। সরকারি

ভবন ও পুলিশের দফতরগুলিতে আগুন লাগাচ্ছে উন্মত্ত জনতা। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭ জনের। এখনও পর্যন্ত ২০ জন নিখোঁজ।

আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতোই জিনিসপত্রের চড়া দামে বিপর্যস্ত ইন্দোনেশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষ। ক্রমেই বাড়ছে করের বোঝা। ধনী-গরিবে ব্যাপক আয় বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। এর উপর সম্প্রতি ধনী ও সুবিধাভোগী নেতা-মন্ত্রীদের গৃহভাতা বিপুল বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে তাঁদের মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়াবে ৬ হাজার ডলারেরও বেশি। অন্য দিকে সে দেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২০০ ডলারেরও কম। বেকারত্বের হার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়াতেই সবচেয়ে বেশি— ১৫ শতাংশ। শ্রমিকদের যতটুকু অধিকার ছিল ২০২০ সালে নতুন কর্মসংস্থান আইন চালু করে তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বছর খানেক আগে ক্ষমতায় বসে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রাবোয়ো সুবিয়ান্তো সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সামাজিক খাতগুলিতে। মন্ত্রিসভার বহর বাড়িয়ে মন্ত্রী-সাংসদদের জন্য বিপুল ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সুবিয়ান্তো সরকার। পাশাপাশি জনজীবনে সামরিক বাহিনীর দখলদারি বাড়ানোরও চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে দিনে দিনে ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য শ্বাসরোধী হয়ে উঠছিল।

এ সবের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। গত ২৮ আগস্ট শ্রমিক সংগঠনগুলির সদস্যরা মজুরি বৃদ্ধি, কর সংস্কারের দাবি তুলে সংসদ ভবন ঘেরাও করেছিলেন। শ্রমিকরা ফিরে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা সংসদ ভবন ঘেরাও করে সাংসদদের ভাতা বাড়ানো ও মিলিটারির ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। ওই দিন রাতেই পুলিশের জলকামানবাহী একটি গাড়িতে পিষে গিয়ে মৃত্যু হয় অনলাইন বাইক চালক এক তরুণের। মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যায় আন্দোলনকারীদের বুকে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদে। দলে দলে পথে নামেন অনলাইন বাইক চালকরাও। দীর্ঘদিন ধরে দেশের অন্য অংশের মেহনতি মানুষের মতো তাঁরাও বিপুল শোষণ আর বঞ্চনার শিকার।

গোটা দেশ জুড়ে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দিনের পর দিন জাকার্তা সহ বান্দু, সেমারাং, সুরাবায়া, মেডানের মতো শহরগুলিতে বিভিন্ন সরকারি ভবন, পুলিশ দফতর সহ সরকারি গাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে থাকে। সাংসদদের বাড়িতে ঢুকেও ভাঙচুর চালান বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ সর্বশক্তি দিয়েও এই বিক্ষোভ রুখতে পারেনি। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট, ব্যাপক গ্রেফতারির পরোয়া না করে দিনের পর দিন পুলিশের সঙ্গে ব্যারিকেড যুদ্ধ চালায় ইন্দোনেশিয়ার প্রবল বিক্ষুব্ধ খেটে-খাওয়া মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও তরুণরা। সংসদ ভেঙে দেওয়ার স্লোগান উঠতে থাকে সর্বত্র। উত্তাল গণরোষের সামনে পড়ে প্রেসিডেন্ট প্রাবোয়ো সাংসদদের জন্য দেয় ভাতা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। পাশাপাশি পুলিশ-মিলিটারি দিয়েই এই ফুঁসে ওঠা গণবিক্ষোভ মোকাবিলা করার হুমকিও দেন তিনি।

সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকটি দেশে গণবিক্ষোভের সাক্ষী থেকেছে বিশ্বের মানুষ। গরিবি-বেকারি-আর্থিক বৈষম্যের প্রতিবাদে, কিংবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের দাবিতে মাত্র কয়েক বছর আগে শ্রীলঙ্কা ও গত বছর বাংলাদেশ, শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের বেপরোয়া বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এ বার জ্বলে উঠেছে ইন্দোনেশিয়া। জীবনযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটির মেহনতি মানুষ ও ছাত্র-যুবরা প্রাণের পরোয়া না করে জ্বলে উঠেছেন বিক্ষোভে। বাস্তবে সংকটে সংকটে জর্জরিত মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মরণ কামড় যত তীব্র হচ্ছে, শোষণ-নির্যাতন-বঞ্চনায় অতিষ্ঠ মেহনতি মানুষের সহ্যের বাঁধ তত দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। কোনও না কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তাঁরা। পুলিশ-মিলিটারির লাঠি-গুলি, রাষ্ট্রের যাবতীয় দমনপীড়নের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের উপর ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবিধান চাইছেন তাঁরা।

কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, যতদিন না পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে তাঁরা সংগঠিত হতে পারছেন, ততদিন হাজার প্রাণবলি দিয়েও শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণযন্ত্রের গায়ে সামান্য আঁচড়টুকুও কাটা যাবে না। অনেক ক্ষতির বিনিময়ে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মেহনতি মানুষকে এ কথা বুঝতে হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার লড়াকু মানুষকেও সংগ্রামের ময়দানেই সে কথা বুঝে নিতে হবে। এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর বক্তব্যে প্রায়শই বলেন, মানুষের দুঃসহ পরিস্থিতি এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে, কখন কোথায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তা আগাম বলা যাচ্ছে না। জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে সেই বিক্ষোভকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের তাই সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে।

ওড়িশায় বিজেপি সরকারের কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল কৃষক বিক্ষোভ

২০০৬-০৭ সালে ওড়িশার তৎকালীন বিজেডি-বিজেপি সরকার বৃহৎ ইস্পাত কোম্পানি আর্সলর মিত্তলকে কেন্দুঝরের পাটানা ব্লকে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য প্রায় ৮৫০০ একর জমি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সেই সময়ে ‘মিত্তল প্রতিরোধ মঞ্চ’ এবং এআইকেকেএমএস প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। ফলে জমি অধিগ্রহণ বন্ধ থাকে। এখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েই বিজেপি সরকার পুনর্বার সেই একই এলাকায় মেগা ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ২৮-৩০ জানুয়ারি জিন্দাল ও পসকো-র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এই কোম্পানিগুলিকে ১০ হাজার একরেরও বেশি কৃষিজমি, যার বেশির ভাগ কৃষকের, এবং কিছু পরিমাণ সরকারি জমি দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এতে প্রায় ২০ হাজার মানুষ (প্রধানত উপজাতি) বাস্তুচ্যুত হওয়ার মুখে।

বিজেপি সরকারের এই জনবিরোধী এবং কর্পোরেটমুখী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ‘জিন্দাল-পসকো প্রতিরোধ মঞ্চ’ গঠন করে এবং এআইকেকেএমএস-এর সহায়তায় ৪ সেপ্টেম্বর কেন্দুঝর কালেক্টরেটের সামনে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। জেলা কালেক্টরের কাছে গণস্বাক্ষর সহ একটি স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয় চাষযোগ্য জমি কোনও ভাবে কোম্পানিকে দেওয়া চলবে না। জিন্দাল-পসকো প্রতিরোধ মঞ্চের সভাপতি ঘনশ্যাম মহন্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চের উপদেষ্টা এবং এআইকেকেএমএস-এর ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক রঘুনাথ দাস বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কেন্দুঝর জেলায় হাজার হাজার একর অব্যবহৃত জমি রয়েছে। বিজেপি সরকার কারখানার জন্য সেই জমি না দিয়ে মূল্যবান চাষযোগ্য জমি বহুজাতিক কোম্পানিকে দিচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন যশিপুর বিধায়ক শম্ভুনাথ নায়েক বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কী ভাবে বিজেপি সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে নিরীহ কৃষকদের কাছ থেকে জমি লুট করছে। জিন্দাল-পসকো প্রতিরোধ মঞ্চের সচিব বেণুধর সর্দার, সহ-সভাপতি সরোজ কুমার সিং বক্তব্য রাখেন। প্রকাশ মল্লিকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়। তাদের দাবি জিন্দাল এবং পস্কোর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করতে হবে, চাষযোগ্য জমিতে কারখানা স্থাপন বন্ধ করতে হবে এবং নিকটবর্তী অনাবাদি সরকারি জমিতে শিল্প স্থাপন করে নিযুক্তির নতুন সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আগরতলায় মহিলা বিক্ষোভ

মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা, বিজ্ঞাপন ও ইন্টারনেটে অশ্লীল প্রচার বন্ধ, মহিলাদের সমকাজে সমমজুরি ও সমমর্যাদার দাবিতে এআইএমএসএস-এর নেতৃত্বে ৪ সেপ্টেম্বর

ত্রিপুরার আগরতলায় মহিলাদের এক সুসজ্জিত মিছিল কর্নেল চৌমুহনী থেকে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে পৌঁছলে সেখানে এক সভা হয়।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব শুক্লা চক্রবর্তী, শেফালী দেবনাথ ও শিবানী ভৌমিক প্রমুখ। উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে সংগঠনের উদ্যোগে ১-৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে এই কর্মসূচি হয়।

পাঠকের মতামত

মুক্তিপথের দিশা

এক চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকের বাবার চায়ের দোকানে এক 'বিবেকবান মাস্টার' এসে চায়ের অর্ডার দেন। সেই চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকের বাবা এক কাপ লাল চা বিবেকবান মাস্টারের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— আচ্ছা মাস্টার, শুনলাম সুপ্রিম কোর্ট নাকি রায় দিয়েছে আগের জমানায় যারা প্রাথমিকে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন তাদের চাকরি টিকিয়ে রাখতে হলে টেট পাস করতেই হবে। তা ব্যাপারটা কী ভাবে নিলেন?

বিবেকবান মাস্টার চায়ের কাপ হাতে গম্ভীর ও নিশ্চুপভাবে বেঞ্চে বসে রইলেন। কারণ তিনি কিছুদিন আগেই এই দোকানে চা খেতে এসে সেই চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকের অসহায় বাবাকে (চা বিক্রেতা) চাকরি ফেরত পাওয়ার জন্য তাঁর ছেলের পুনরায় পরীক্ষায় বসতে আপত্তি প্রসঙ্গে গলা ফাটিয়ে বলেছিলেন, যোগ্য হলে আবার পরীক্ষায় বসতে অসুবিধা কোথায়।

অর্থাৎ যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি হারানো নিয়ে রসিকতা করা সেই বিবেকবান মাস্টারের মুখে আজ শুধুই নীরবতা।

চা বিক্রেতা বাবা মাস্টারের নীরবতা দেখে বলে উঠলেন, তা হলে তো কথাটা স্পষ্ট মাস্টার। আগের জমানায় যারা চাকরি পেয়েছিলেন সত্যি যদি তারা যোগ্য হন আর তাদের নিয়োগে দুর্নীতি না হয়ে থাকে, তা হলে পরীক্ষায় বসতে ভয় কীসের! চায়ের দোকানে উপস্থিত কয়েক জন চুপচাপ শুনছিলেন। কারও চোখে মুখে কৌতূহল, দোকান জুড়ে নেমে এল অদ্ভুত এক নীরবতা। মনে হচ্ছিল চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকের অসহায় বাবার কথাগুলো বিবেকবান মাস্টারের বিবেককে বিদ্ধ করছে। বিবেকবান মাস্টার হয়তো জানতেন সত্য কথার ওজন সবসময়ই ভারী হয়। তাই আর কিছু না বলে নিঃশব্দে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ওই মাস্টারকে বলা দরকার—আজ যেটা অন্যের সমস্যা ভাবছেন, কাল সেই সমস্যা আপনার কাঁধে এসে পড়তে পারে। তাই অন্যের সমস্যা শুনে মজা বা রসিকতা করবেন না, অন্যের পাশে দাঁড়ান, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই সমস্যা বা সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

বিট্টু দেবনাথ
ইংরেজবাজার, মালদা

সাবধানী স্বীকারোক্তি

অন্ধকার হতাশ্বাস সমাজের বন্ধ্যাত্ব ও বৈকল্যের বিপরীতে শাসকের ত্রাস তৈরির জন-আন্দোলন স্বরূপ দীপালোকের মূল্য অপরিসীম।

১২ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে, আরজিকর আন্দোলনের বৎসরান্তিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় এই আন্দোলনকে নাগরিক আন্দোলনের দীপালোক বলেছেন। বলেছেন অন্ধকার হতাশ্বাস সমাজে সে দীপালোকের মূল্য অপরিসীম। তাঁর মতে সংসদীয় অর্থে এই আন্দোলনের ফলাফলে তেমন কোনও হেরফের না ঘটলেও, আন্দোলনের নাগরিক চরিত্রটি ভয়ঙ্করভাবে শাসকের ত্রাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। সম্পাদকীয়র শেষ প্যারাগ্রাফে বেশ তারিফ করে বলা হয়েছে, এক বছর পর ফিরে তাকিয়ে পশ্চিমবাংলার জীবনখাতার হিসাবনিকাশে সুতরাং একটি প্রাপ্তি উজ্জ্বল নাগরিক আন্দোলনের পুনর্জীবন লাভ। ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট-এর রাত জাগো কার্যক্রম থেকে যে জন-আন্দোলন ঐতিহাসিক আকার ধারণ করেছিল, তা অবশ্যই শাসকের ত্রাস তৈরির পক্ষে যথেষ্ট। নাগরিকের লাগাতার শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ ও অবরোধের মাধ্যমে শাসকের ত্রাস ধরিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। বিভিন্ন প্রকার বন্ধ্যাত্ব ও বৈকল্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা পেরেছিলেন। অভয়া জেনে গেলেন না তাঁর কারণেই একটি দীপ জ্বলে উঠেছিল। অন্ধকার হতাশ্বাস সমাজে সে দীপালোকের মূল্য অপরিসীম।

নাগরিক আন্দোলনের তেজ, দৃঢ়তা, সংসদীয় হিসাব নিকাশের হীনস্পর্শ মুক্ত রাখার ক্ষমতাটিকে মূলে রাখা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন সংসদীয় রাজনীতির বন্ধ্যাত্ব ও বৈকল্যের প্রতি মোহমুক্ত জনমনের প্রতিস্পর্ধা ও প্রতিরোধমূলক সক্রিয়তা। যা কিনা, স্পষ্টত সংসদীয় রাজনীতির বহমান স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে, তার সংশ্রবকে 'গো ব্যাক' বলতে পেরেছে। নাগরিকের এই তো সেই চেতনা, যা শাসকের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দেয়।

আমাদের বাংলায় পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে লাগাতার গণআন্দোলন ও সাধারণ মানুষের আত্মবলিদানকে সংসদীয় গলিতে হারিয়ে যেতে দেখেছেন জনগণ। এই কলকাতায় বামপন্থার উপাসক কত শত মানুষ ও শিল্প-সাংস্কৃতিক জগতের ক্ষমতাধর সংগ্রামী ব্যক্তিত্বকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিপথগামী হয়ে যেতে দেখেছে এই কলকাতা— এই বাংলা। জনগণ তা দেখেছেন, মোহগ্রস্ত হয়ে, আশান্বিত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে, কিন্তু পথ খুঁজে পাননি। কত যুগ ধরে কত পরিবর্তন দেখেছে বাংলা, কিন্তু জনগণ বিচার পায়নি, সমস্যার তিলমাত্র সমাধান হয়নি, বরং দিন দিন তার মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে গিয়েছে। যদিও সংসদ আছে, সাংসদ আছেন, বিধানসভা আছে, এম এল এ আছেন—এই তো সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আর তার সংসদীয় রাজনীতির বন্ধ্যাত্ব ও বৈকল্য।

শুধু একটি অভয়াকাণ্ড? হাজার লক্ষ বঞ্চনা-নির্যাতন-নিষ্পেষণের ঐতিহাসিক হিমশৈলের চূড়ার দৃশ্যমান একটি পর্ব মাত্র।

যদিও, দাবি আদায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যে বিষয়ের দিকে আজ মনোনিবেশ করতে চাই— দাবি আদায়ের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিন্নতর এই আঙ্গিক যা সংসদীয় রাজনীতির দুষ্টচক্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট চেতনার দৃশ্যতই এক সংগ্রামী ফ্রন্ট। জনগণের প্রত্যাশার, লড়াইয়ের, আন্দোলনের দাবি আদায়ের নিজস্ব সংগ্রামী হাতিয়ার, উন্নততর সংস্কৃতি সম্পন্ন, সচেতন, সঙ্ঘবদ্ধ, আপসহীন।

প্রদীপ কুমার দাস
বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

শুল্কযুদ্ধের উলুখাগড়া শ্রমিকরাই

তিনের পাতার পর

বাড়ালে মার্কিন বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে ঠিকই, কিন্তু এই কষ্টটা সহ্য করে নিলে আমদানি কমবে। ফলে দেশে কারখানা বাড়বে, কৃষি ক্ষেত্রেও আমদানি কমবে, ফলে তোমরা কাজ পাবে।

এই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইঞ্জিন মার্কিন অর্থনীতির হাল। অতি মুনাফার চেষ্টায় অন্য দেশের শ্রমকে সস্তায় খাটিয়ে পুঁজিপতিরা মুনাফা লুটেছে। তাতে মার্কিন জনগণের বেকারত্ব বেড়েছে। এখন শুল্ক চাপিয়ে দেশীয় শিল্পের হাল ফেরানো দূরে থাক নতুন সংকট ডেকে আনছে এই নীতি। যে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ পুঁজিবাদী বাজারের সংকট কাটাবে বলে এত প্রচার, তার থেকেই এখন পালাতে চাইছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট! কোথায় গেল 'গ্যাট'-চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুইটিও)-র রমরমা? ১৯৯০ থেকে ডব্লুইটিওকে দিয়ে বহুজাতিক পুঁজি মালিকরা অন্য দেশের বাজার লুঠ করতে কত রকম শর্ত চাপিয়েছে। অথচ আমেরিকান সরকার ২০১৯ থেকে এই সংস্থার অ্যাপেলেট বডি তৈরিতেই বাধা দিয়ে চলেছে। বাণিজ্য নিয়ে কোনও বিবাদের মীমাংসার উপায়ই তারা রাখতে চাইছে না। কারণ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে কোনও নীতি-নিয়মের বালাই থাকলেই মার্কিন পুঁজির সর্বনাশ। এখন চিন, রাশিয়া, জাপান, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সম্মিলিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ভারত ইত্যাদি দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাজারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেশগুলির বৃহৎ পুঁজির মালিকরা কখনও নিজেদের স্বার্থে নিজ দেশের সরকারকে আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেয়। যেমন ভারতীয় পুঁজিপতিদের নিযুক্ত প্রতিনিধি নরেন্দ্র মোদি মার্কিন প্রেসিডেন্টদের দেখলেই জড়িয়ে ধরে ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে ব্যগ্র হন। অন্যদিকে বাজার দখলের লড়াইতে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বাজারে তাদের পারস্পরিক টক্কর চলে। এরা সকলেই খোলা বাজার অর্থনীতির সমর্থক অন্য দেশের বাজারে ঢোকার সময়। নিজের দেশের বাজারে পাঁচিল তুলে তারা অন্য প্রতিযোগীদের পণ্য এবং বিনিয়োগ আটকায়।

যে কথা দিয়ে লেখাটা শুরু হয়েছিল— নরেন্দ্র মোদি জাপানে গিয়ে বিনিয়োগের জন্য গাঁটছড়া বাঁধতে চেয়েছেন। জাপানে ৫০ হাজার ভারতীয়ের কর্মসংস্থানের জন্য উমেদারি করেছেন। এর আগে তিনি ইজরায়েলে, রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক পাঠানোর উমেদারিতেও হাত পাকিয়েছেন। ভারতীয় পুঁজিপতিদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার অভাব। ভারতকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বানিয়ে ফেলার চেষ্টায় মোদিজিরা যতই ছাতি ফোলান, বাস্তবটা অন্য কথা বলে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ দেশের অর্থনীতির বহর বাড়ছে। অথচ ভারতীয় এবং ভারতে লগ্নি হওয়া বিদেশি পুঁজি ক্রমাগত দেশের বাইরে ছুটছে। ২০২৪-২৫-এ ভারত থেকে বিদেশি পুঁজি বাইরে চলে গেছে ৫২ বিলিয়ন ডলার, দেশীয় পুঁজি মালিকরা একই সময়ে ২৯ বিলিয়ন ডলার পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগ করেছেন। ভারতে এসেছে মূলত মরিশাস থেকে ঘুরপথে বিনিয়োগ হওয়া পুঁজি। ভারতীয় ধনকুবেরদের পুঁজিও ঘুরপথ ধরে বিদেশি পুঁজির আকার নিয়ে আসে এই রাস্তায়। এই পুঁজির বেশিরভাগই খাটে শেয়ারের ফাটকায়, কোনও উৎপাদনে লাগে না। ফলে অর্থনীতির বহর বাড়লেও উৎপাদনে খরা। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প এবং অন্যান্য শ্রমনিবিড় শিল্পগুলো ধুঁকছে (ফ্রন্টলাইন, ৩১ মার্চ ২০২৫) । ভারতের মতো বিশাল ও জনবহুল দেশে আভ্যন্তরীণ বাজারে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এতটাই কমে যাচ্ছে যে শুধু রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতিতে মুনাফার পূর্ণ চাহিদা পুঁজিমালিকদের মিটছে না। এমতাবস্থায় বিদেশি পুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় ধনকুবেররা দেশের বাজারে যে বিনিয়োগ করার আশায় ছিল, তার বেশিরভাগটাই অপূর্ণ। সারা দেশের শ্রমশক্তির মাত্র ১১.৫ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কাজ করে, বেশিরভাগ শ্রমিকই অত্যন্ত খারাপ পরিবেশ ও পরিকাঠামোর মধ্যে অতি নিম্ন উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত। ভারত থেকে অ্যাপেল, নোকিয়া, স্যামসাঙ, ওপো ইত্যাদি মোবাইল ফোন অ্যাসেমব্লিং-এর যে কাজ হয়, সেটাই ভারতীয় রপ্তানির বেশ কিছুটা জুড়ে থাকে। তাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কোনও মতেই বাড়ে না (ওই)। এটাই ভারতীয় পুঁজির অন্যতম বড় সংকট।

শ্রমিকের পাশে কোনও সরকার নেই

কিছু নামী দামি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ আশা দেখিয়েছিলেন, চিন-মার্কিন দ্বন্দ্বে সস্তা শ্রমশক্তির দেশ হিসাবে বিপুল বাজারের সুযোগ পাবে ভারতীয় পুঁজি। যে কারণে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারত এই চার শক্তির জোট 'কোয়াড'-এর ওপর জোর দিয়ে মার্কিন সাহায্যে চিনের হাত থেকে এশিয়ার কিছু বাজারের দখল পাওয়ার আশায় ছিল ভারতীয় পুঁজিমালিকরা। কিন্তু চিনের শক্তি, মার্কিন পুঁজির বাজার ছাড়ার অনীহার কারণে তা পূর্ণ হচ্ছে না। ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে চিন, রাশিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশকে নিয়ে গঠিত ব্রিকসের সদস্য হয়েছে ভারত। রাশিয়া, চিনের জোরে এই গোষ্ঠী এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপে মার্কিন শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছে। এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের বিকল্প মুদ্রা আনারও হুমকি দিয়েছে। এর মোকাবিলা করতে মার্কিন কর্তারা একদিকে শুল্ক যুদ্ধের রাস্তায় নেমেছেন। অন্যদিকে সরাসরি সামরিক কৌশলগত যুদ্ধেরও হুমকি দিচ্ছেন। চাপ সৃষ্টি করতে ভারত-রাশিয়া উভয়কেই মৃত অর্থনীতি বলেছেন ট্রাম্প। তার মোকাবিলায় এসসিও-র মতো জোটের সাহায্য নিয়ে ভারতীয় ধনকুবেরদের জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার পরিসর বার করতে খোদ প্রধানমন্ত্রী ছুটেছিলেন চিনে। শুল্ক যুদ্ধ শুরু হতে পুঁজি মালিকদের জন্য কিছু সরকারি প্রকল্পের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভোগা শ্রমিকদের কথা সরকারের মুখে শোনা যায়নি। দেশটা আসলে কাদের এতেই স্পষ্ট হয়।

কলেজে ৭৫ শতাংশ আসন ফাঁকা ঃ গভীর সংকটে শিক্ষা

এ বছর রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি-চিত্র দেখলে যে কোনও সচেতন মানুষ শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। রাজ্য সরকারের সংকীর্ণ রাজনীতির পরিণামে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর আগস্টের শেষ সপ্তাহে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেখা গেল, কলেজে ৭৫ শতাংশের বেশি আসন ফাঁকা।

রাজ্যে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজের সংখ্যা ৪৬০। স্নাতক স্তরে আসন সংখ্যা সাড়ে ৯ লাখ। কিন্তু ভর্তির জন্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালে আবেদন জমা পড়েছে ৩ লক্ষ ১০ হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ভর্তি হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৩১ হাজার। ২৯ আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। তারপরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলেও হতে পারে। কিন্তু তা খুব বেশি হবে না। কারণ যারা সত্যিই ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তিন মাস অপেক্ষা করার পর আরও অপেক্ষা করবে, এটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তা হলে আবেদন করেও ভর্তিতে হাজার হাজার ছাত্রের অনাগ্রহ। আবার দেখা যাচ্ছে, ভর্তির পরও কিছু ছাত্র নিজেরাই ভর্তি ক্যান্সেল করেছে।

কলেজভিত্তিক ভর্তির চিত্রটি ঠিক কী রকম? বেথুন কলেজে ৬৭৮টি আসনের মধ্যে ১৭৩ জন ভর্তির জন্য নথি যাচাই করেছে। মৌলানা আজাদ কলেজে ২২৬৩টি আসনে ৩৪৪ জন ভর্তির পরে নথি যাচাই করেছে। হুগলির উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে ২৪২৬টি আসন। ৫১৭ জন ভর্তির পরে নথি যাচাই করেছে। উত্তর ২৪ পরগণার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলেজে ১৩৫৩ আসনে ১২৮ জন ভর্তির পর নথি যাচাই করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে ৩৯০০ আসনের মধ্যে নথি যাচাই করে ভর্তি হয়েছেন ১২৩৩ জন। এই চিত্র কমবেশি প্রায় সব সরকার-পোষিত কলেজেই।

কলেজে কলেজে বিপুল সংখ্যক আসন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তবে কি উচ্চশিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কমছে? কী বলছেন অধ্যাপকরা? অনেক কলেজ শিক্ষকের বক্তব্য, চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের যা সিলেবাস, তা পড়ে কী হবে? কোথায় চাকরি পাবে ছেলেমেয়েরা? তাই গত দু'বছর ধরেই ছাত্ররা দিশাহীন। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, সাধারণ ডিগ্রি কোর্স করে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে ছাত্রীদের অনেকেরই নার্সিং বা বিউটিশিয়ান সহ নানা পেশাদারি কোর্সে ঝোঁক বেশি।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্স বা পেশাদারি কোর্স করলেই কি চাকরি মিলছে? বা মিললেও একটা সম্মানজনক বেতন মিলছে? একদমই না। একটা ক্ষুদ্রতর অংশের চাকরি হচ্ছে। বেশির ভাগেরই হচ্ছে না। ফলে এখানেও পড়ছে নৈরাশ্যের ছায়া। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা যাচ্ছে, পাঁচ-ছ'বার কাউন্সিলিং করেও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি বুনিয়াদি স্ট্রিমে বহু আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। অর্থাৎ সরকারি হোক বা বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই বুনিয়াদি বিষয়ে এখন ছাত্র ভর্তিতে ভাটা।

এখন পড়াশোনা হয়ে উঠছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সিপিএম সরকারের আমলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পর থেকে সরকারি স্কুল থেকে বেসরকারি স্কুলে ছাত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা চলছেই। শহরাঞ্চলে সরকারি স্কুল এখন প্রায় ফাঁকা। অন্য দিকে শহরাঞ্চলের বেসরকারি স্কুলগুলির বিভিন্ন ক্লাসে ভর্তি ফি সহ অন্যান্য খরচের কথা শুনলে চমকে উঠতে হয়। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১৭ হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি দিতে হয়েছে। সঙ্গে বই-খাতার জন্য ১০ হাজার টাকা। এরপর রয়েছে মাসে মাসে ১৬০০ টাকা করে বেতন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ তো আছেই। পাশাপাশি আছে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর। তাঁদেরও বেতন বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুযায়ী নেহাত কম নয়। সব মিলে শিক্ষা একটা রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। একটু নামী স্কুল হলে বার্ষিক এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা বা কোথাও তারও বেশি নেওয়া হয়। এই সমস্ত দামি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি দামি কলেজগুলি ভরাচ্ছে। সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের একটা বড় অংশ শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। পড়ুার অভাবে রাজ্যে ৮ হাজার সরকার পোষিত স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েক হাজার বন্ধ হওয়ার পথে। সরকার-পোষিত কলেজগুলিও এরপর ছাত্রের অভাবে বন্ধ হতে থাকবে। এ এক মারাত্মক সংকট।

জ্ঞানজগতেও সঙ্কট দেখা দেবে। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ ব্যাহত হবে। সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে পড়ার আগ্রহ বহু দিন আগেই কমা শুরু হয়েছে। এখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জুলজি, বোটানি ইত্যাদি নিয়েও পড়ার আগ্রহ কমছে। অথচ এগুলি বুনিয়াদি বিষয়। এগুলোকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন প্রয়োগিক বা ফলিত শাখার বিকাশ ঘটে। বুনিয়াদি বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা কমে গেলে বা পড়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেলে উচ্চ মেধার ছাত্রছাত্রী আসবে কোথা থেকে? এর ফল হবে জ্ঞানজগতে গভীর অমাবস্যা। শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেয়। এখানে ছাত্ররা সমাজকে খুঁটিয়ে চিনতে ও ভালমন্দ বিচার করতে শেখে। শিক্ষা মানুষকে নতুন নতুন চেতনা দেয়। ফলে কোনও অবস্থাতেই শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি হোক এটা কেউ মেনে নিতে পারেন না।

শিক্ষার কথা উঠলেই এ দেশের সরকারি কর্তা এবং কর্পোরেট জগতের কর্ণধাররা বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে 'এমপ্লয়িবিলিটি' অর্থাৎ কাজে পাওয়ার যোগ্যতা দক্ষতা তৈরি হয় না বলেই সমস্যা। সে জন্যই বুনিয়াদি বিষয় পড়ার চাহিদা নেই। যেন টেকনিক্যাল ট্রেনিং হলেই চাকরি একেবারে দোরগোড়ায় ধর্না দেবে? তা হলে ২ লক্ষের বেশি ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার, লক্ষ লক্ষ টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা পাশ করা যুবক-যুবতী বেকার কেন? প্রথমত, বুনিয়াদি বিষয় পড়া ও তার চর্চা কেবলমাত্র কিছু দক্ষতা অর্জনের জন্য নয়, এই চর্চা না হলে কারিগরি বিদ্যাও সৃজনশীল হতে পারে না। কিন্তু সরকারের শিক্ষানীতি হল— টাকা যার শিক্ষা তার। তাই দামি স্কুল-কলেজ এবং দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সাধারণ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকে ধ্বংস করতে উদ্যত তারা। এটা শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির পরিকল্পনারই অংশ। এই কারণেই রাজ্য সরকার এই বছর ভর্তি শুরু করতে দেরি করেছে, যাতে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে ছুটতে বাধ্য হয়।

চাকরির সঙ্কট স্বাভাবিক ভাবে জন্ম দিয়ে চলছে সর্বত্র নিয়োগ-দুর্নীতি। এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আদালতে মামলা হল। তারপর আদালতের রায়ে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গেল। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সুতোয় ঝুলছে। এসএসসি, পিএসসি, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন সহ চাকরির নানা পরীক্ষায় নানা অনিয়ম, স্বজনপোষণ-দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়া দুষ্কর। এই প্রবণতা কম-বেশি সব রাজ্যেই। এ রাজ্যে বছরের পর বছর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাই হচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে শিক্ষকতা করার আশা কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং যাচ্ছেও।

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনলাইন শিক্ষার উপর যে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামী দিনে শিক্ষকের প্রয়োজনই কমে যাবে। একাধিক স্কুলকে জুড়ে দিয়ে যে ক্লাস্টার সিস্টেম আসছে রাজ্যে রাজ্যে তাতেও শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। এই প্রেক্ষাপটে বুনিয়াদি বিষয়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাস করেই ছাত্ররা এখন যোগ দিচ্ছে কায়িক শ্রমভিত্তিক স্বল্প বেতনের কাজে। জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা মারাত্মকভাবে অবহেলিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা সীমায়িত হয়ে পড়ছে মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষের মধ্যে। জাতির সামনে এক বড় দুর্দিন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শেরফুল আনসারি ১৫ আগস্টবহরমপুর মেডিকেল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সারা জেলায় দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড শেরফুল আনসারির জন্ম জেলার ফাজিলনগর অঞ্চলের এক দরিদ্র তাঁতি পরিবারে। ছাত্র বয়সেই তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ও উন্নত রুচিপূর্ণ আচরণের প্রভাবে এলাকার মানুষ তাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করত। তিনি শ্রমজীবী মানুষদের সঠিক সময়ে সঠিক বেতন দেওয়ার দাবিতে এবং তাঁত শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২৯ আগস্ট ফাজিলনগর কাছারিপাড়ায় এস ইউ সি আই (সি) নদিয়া উত্তর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সেখ খোদাবক্স। আরএসপি-র পক্ষ থেকে কমরেড আসিরুল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ। উপস্থিত ছিলেন তিন শতাধিক কর্মী-সমর্থক-দরদি ও সাধারণ মানুষ।

কমরেড শেরফুল আনসারি লাল সেলাম

শিশু-কিশোর সম্মিলনী গঠনের প্রস্তুতি কমসোমলের

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর কিশোর সংগঠন কমসোমলের বর্ধিত রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে। সভা পরিচালনা করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত ও কমরেড অনুরূপা দাস। সভায় কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, শুধু নিজের জন্য ভাবার ক্ষুদ্র মানসিকতার বাইরে গিয়ে সদস্যদের আরও উন্নত চরিত্র গঠনের কঠোর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য দেশ-বিদেশের মহান ব্যক্তিদের জীবনকে জানতে হবে। পাশাপাশি কমসোমলের প্রতিষ্ঠাতা এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন তিনি।

শিশু-কিশোরদের সুস্থ এবং উন্নত রুচি সংস্কৃতি মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কমসোমলের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় শিশু কিশোর সম্মিলনী গঠন করার প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সংগঠনের কাজকে আগামী দিনে রাজ্যব্যাপী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমরেড শুভেন্দু মণ্ডল ও কমরেড সংযুক্তা দত্তকে যুগ্ম কনভেনর করে ২০ জনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশি তকমায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে চালান

বীরভূম জেলার পাইকর থানার পাইকর গ্রামের দুই পরিযায়ী শ্রমিক দিল্লিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন ২৪ জুন। সেই দুটি পরিবারের ছয় জনকে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। জানা যায়, দু'মাস ধরে তারা বাংলাদেশ সংশোধনাগারে আটক হয়ে আছেন। এই ঘটনায় ২৫ আগস্ট মুরারই লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে তিনজন প্রতিনিধি ওই দুই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আটক পরিযায়ী শ্রমিকদের মুক্ত করার দাবিতে প্রশাসনের কাছে জানাতে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 7 Bengali Weekly September 12, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

অভয়াকাণ্ডে দোষীদের শাস্তি চেয়ে ‘গ্লোবাল প্রোটেস্ট’

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা নাগরিক সংগঠন ‘ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ উইমেন’-এর পক্ষ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর গ্লোবাল প্রোটেস্টের অংশ হিসাবে কলকাতায় এনআরএস মেডিকেল কলেজের সামনে অভয়ার ন্যায়বিচার সহ সমস্ত ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকরা গান কবিতা পথনাটক পরিবেশন করেন। সভা পরিচালনা করেন কুহু দাস, বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক ডাক্তার বিপ্লব চন্দ্র, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী, ডাক্তার সজল বিশ্বাস সহ অন্যরা। এক মোমবাতি মিছিল এনআরএস কলেজ থেকে মৌলালি হয়ে প্রাচী সিনেমা হলের সামনে শেষ হয়।
মৌলালি মোড়ে মানববন্ধন হয়।
কর্মসূচি থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর সিবিআই দপ্তর অভিযান ঘোষণা করা হয়।

হাওড়ায় ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ

ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামত, জমা জল দ্রুত অপসারণ, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, নিয়মিত জঞ্জাল ও নর্দমা সাফাই এবং পরিশ্রুত ও পর্যাপ্ত পানীয় জলের দাবিতে ২৯ আগস্ট হাওড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও ডিএম ডেপুটেশন হয়। এস ইউ সি আই (সি) হাওড়া সদর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত ও শুকদেব বারিকের নেতৃত্বে হাওড়া ময়দান থেকে মিছিল হয়। জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশ মিছিল আটকায় এবং সেখানেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির সদস্য শ্রীরূপ দাস এবং উত্তম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেন। মহকুমা শাসক দাবিগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দেন।

প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহ করুন

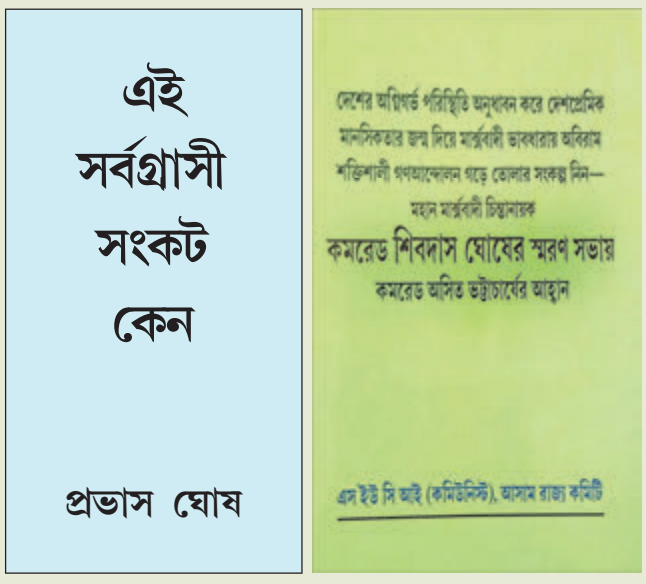

করিমগঞ্জে পুলিশি হামলা

এস ইউ সি আই (সি)-র নিন্দা

‘করিমগঞ্জ জেলা নাম পরিবর্তন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটি’র উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ জেলায় সর্বাত্মক বনধ ভাঙতে শাসক দল হামলা চালায়। বদরপুর এনসি কলেজের ছাত্ররা ওই দিন আন্দোলনের সমর্থনে ক্লাস বয়কট করে পথ অবরোধ করলে ছাত্রদের ওপর পুলিশ নির্মম লাঠিচার্জ করেই ক্ষান্ত হয়নি। পুলিশ কলেজে ঢুকে একজন শিক্ষক সহ কয়েক জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে ডিসি-এসপির প্রত্যক্ষ নির্দেশে। এমনকি আহত ছাত্রদের হাসপাতাল থেকে জোর করে তুলে নেওয়া হয়। এখনও একজন ছাত্র চিকিৎসাধীন।

ছাত্রদের ওপর প্রশাসনের এ ধরনের অত্যাচারের প্রতিবাদে ‘করিমগঞ্জ জেলা নাম পরিবর্তন প্রতিরোধ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি’র আহ্বানে সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ৮ সেপ্টেম্বর বদরপুর ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। এই ধর্মঘট বানচাল করার জন্য পুলিশ আর আধা সামরিক বাহিনী সকাল থেকে ফ্ল্যাগ মার্চ করে এবং ঘর থেকে কিছু ছাত্রকে কলেজে তুলে নিয়ে যায়। কলেজের বাইরে ছাত্রদের ওপর নির্মম লাঠিচার্জ করে এবং দুই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কলেজের ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে কলেজের মাঠে অবস্থান শুরু করেন। ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে তাঁরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান চালিয়ে যান।

ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের ওপর এই ধরনের আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আহুত সর্বাত্মক হরতাল সফল করতে গিয়ে ছাত্রদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

করিমগঞ্জ ঃ সর্বাত্মক বনধ

একের পাতার পর

পুলিশের সামনেই এসব ঘটনা ঘটলেও তারা ছিল নীরব দর্শক।

জেলার অন্যতম শহর বদরপুরে নবীনচন্দ্র কলেজের কয়েক শত ছাত্রছাত্রী বনধের সমর্থনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সেখানে জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ করে। আহত হন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৯ নভেম্বর আসামের বিজেপি সরকার মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে ‘শ্রীভূমি’ করে দেয়। এ কাজ করতে গিয়ে জনমতের কোনও তোয়াক্কা করা হয়নি। কারও সাথে কোনও আলাপ আলোচনা করা হয়নি। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে ভূলুণ্ঠিত করে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি থেকে এই নাম পরিবর্তন করা হয়। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) দলের উদ্যোগে এক গণ কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ‘স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটি’। নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় ৬ সেপ্টেম্বর জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়।

সরকার করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমি করার ক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শ্রীহট্ট সফরে এসে করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমি রেখেছিলেন। এটা সত্যের অপলাপ ও ইতিহাসের বিকৃতি। প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে সিলেট বা শ্রীহট্টকে বাংলা প্রদেশ থেকে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮৭৮ সালে করিমগঞ্জ শহরকে নবগঠিত আসাম রাজ্যের সিলেট জেলার একটি মহকুমা হিসাবে গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শ্রীহট্ট পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায় এবং করিমগঞ্জ সহ আড়াই থানা গণভোটে ভারতের অঙ্গ হয়।

১৯১৯ সালের ৫ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট সফরে আসেন। তিনি শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতায় লেখেন, মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/নির্বাসিতা তুমি/সুন্দরী শ্রীভূমি। তা হলে যে শ্রীভূমি এখন বাংলাদেশের অংশ, সেই নামে আসামের একটি জেলার নামকরণের অর্থ কী? রবীন্দ্রনাথ কোথায় বলেছেন, করিমগঞ্জ শ্রীভূমি! বলেছেন, শ্রীহট্টকে। বিজেপি সরকার করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমি করার চেষ্টা করছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর মতলবেই। এই নাম পরিবর্তনের সাথে করিমগঞ্জ জেলার পরিকাঠামোগত বা মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই।

এই নাম পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন নথিপত্র পরিবর্তন করার জন্য নানা অপ্রয়োজনীয় ঝামেলার মধ্যে পড়বেন এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে আর্থিক বোঝা বাড়বে শুধু নয়, নানা হয়রানির শিকার হবেন। এই সর্বাত্মক সফল বনধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জেলার সাধারণ মানুষ জেলার নাম পরিবর্তনের পক্ষে নন। এ দিন বিকেলে নাগরিক কমিটি আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক অরুণাংশু ভট্টাচার্য জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

ধর্মঘটের দিন বিজেপি গুণ্ডাবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেলেন না পিকেটিংরত মহিলারাও

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com